উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বৃহস্পতিবার ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ১৯৭ সংখ্যা

গোরক্ষকদের তাণ্ডব

স্বঘোষিত গোরক্ষকদের তাণ্ডবে রক্তাক্ত উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর। গত সোমবার উন্মত্ত জনতার আক্রমণে ওখানে প্রাণ হারান পুলিশ ইনস্পেক্টর সুবোধকুমার সিং। আরও এক তরুণ সুমিত সিং গোলমালের মাঝে নিহত হন। রাজধানী দিল্লি থেকে প্রায় সত্তর কিলোমিটার দূরের এই শহরটি উত্তরপ্রদেশের অন্যতম কর্মচঞ্চল এলাকা। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সেখানে মিলেমিশে বাস করে। সেখানে ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে সাক্ষরতার হার ৮১.০৭ শতাংশ। এমন একটি শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে কীভাবে উন্মত্ত জনতার আক্রমণে একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরকে নৃশংসভাবে নিহত হলেন তা নিয়ে দেশব্যাপী চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি ও সেইসব সংগঠনের স্থানীয় কিছু নেতা। পুলিশ ইনস্পেক্টর হত্যার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত যোগেশ রাজ ওই শহরের বজরং দলের প্রধান শুধু নন, উত্তরপ্রদেশ বিজেপি যুব মোর্চারও সদস্য। অন্য অভিযুক্তরাও সকলেই কঠোর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ফলে এই নৃশংস ঘটনায় গেরুয়া শিবির তাদের দায় অস্বীকার করতে পারে না। জনৈক কৃষকের জমিতে গোরুর দেহাংশ পড়ে থাকার অভিযোগ নিয়ে গোলমালের সূত্রপাত। যদিও অনুসন্ধানে প্রকাশ, সেখানে আগে কেউ তা দেখেনি। গোরক্ষক দলের নেতা-সমর্থকরাই তা গ্রামবাসীদের গোচরে আনেন ও ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিংসায় ইন্ধন দেন। নিহত পুলিশ ইনস্পেক্টর সুবোধকুমার সিং তিন বছর আগে দাদরিতে গোরক্ষকদের আক্রমণে নিহত মহম্মদ আখলাকের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছিলেন। অসাম্প্রদায়িক, উদার মনের মানুষ হিসাবে তিনি সুপরিচিত। তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলেও বিভিন্ন মহলের অভিযোগ। যেভাবে কৃষিজমিতে গোরুর দেহাংশ ফেলা হয়েছিল, তা পূর্বপরিকল্পনার অংশ বলে স্থানীয় মানুষের অনেকেই মনে করেন। এমনকি যাঁদের জমিতে তা পাওয়া যায়, তাঁরা এই বিষয়ে আগে অবহিত থাকা তো দূরস্থান, এই নিয়ে কোনো হইচইও করেননি। অথচ বহিরাগত একদল মানুষ এইসব দেহাংশ নিয়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে আক্রান্ত হয়। নিহত সুবোধকুমার সিংয়ের গাড়ির চালক স্বীকার করেছেন, উন্মত্ত জনতার হিংস্র আক্রমণ থেকে বাঁচতে তিনি গাড়ি রেখে চলে যান এবং গাড়ির মধ্যেই করে হত্যা করা হয় ইনস্পেক্টর সিংকে। এই ঘটনা সুপরিকল্পিত কিনা, কারা এর সঙ্গে জড়িত, সেইসব কিছুই তদন্তে উঠে আসবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এই ঘটনা ফের সারা বিশ্বের কাছে নিঃসন্দেহে দেশের মুখ পুড়িয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এই ঘটনা যে একটা বড়ো ষড়যন্ত্র তা মেনেছেন উত্তরপ্রদেশের ডিজিপি ওমপ্রকাশ সিংও। বুধবার তিনি জানিয়েছেন, এটি নিছক আইনশৃঙ্খলার ঘটনা নয়। সিট এর তদন্ত করছে। পুরো বিষয়টি তদন্তে পরিষ্কার হবে বলে তাঁর আশা। সাড়ে চার বছর আগে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসীন হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন অংশে গোরক্ষক নামে নজিরবিহীন হিংসা ছড়িয়েছে। ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল অবধি গোরক্ষার নামে ৬৩টি আক্রমণ হয়। ২৮ জন প্রাণ হারান, তার মধ্যে ২৪ জনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। বিজেপি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই ঘটনা আরও বৃদ্ধি পায় বলে তথ্য সূত্রে প্রকাশ। উত্তর ভারতে গোরক্ষকদের তাণ্ডব ক্রমেই মাত্রাছাড়া হচ্ছে। তিন বছর আগে ফ্রিজে গোমাংস রাখার গুজব তুলে মহম্মদ আখলাককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বুলন্দ শহরে নিহত পুলিশ আধিকারিক সুবোধকুমার সিং এই ঘটনার নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করছিলেন। তাই কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা তাঁকে নিশানা করেছিল, এমন সম্ভাবনা দেখছেন কোনো কোনো মহল। উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারের শাসনকালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ যেন ক্রমে আরও আলগা হয়ে চলেছে। নেতা-মন্ত্রীদের প্ররোচনামূলক নানা বক্তব্যে দেশের চিরাচরিত ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি এখন মলিন। শীর্ষ আদালতের তিরস্কার, সমালোচনাও গ্রাহ্য করা হচ্ছে না। এরফলে শুধু যে সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে তা নয়, দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব পড়ছে। যারা ডিজিট্যাল ভারত গঠনের কথা বলে, তারাই আবার প্রাচীন কুসংস্কারকে যদি প্রশয় দেয় তবে তার বিষময় ফল ভোগ করবে সমগ্র দেশ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্যতম পীঠস্থান বুলন্দশহরের ঘটনাকে তাই লঘু করে দেখা যাবে না। কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসক নিশ্চয়ই তা উপলব্ধি করবে।

অমৃতধারা

বাস্তবিক পক্ষে দুর্বিপাক, ক্লেশকে পাপের শাস্তি না ভেবে বরং সদ্‌গুণের পুরস্কার হিসাবে প্রায়শ মেনে নেওয়া যেতে পারে, কারণ এরাই শেষে মহত্তম স্বপ্রকাশে প্রচেষ্টবান অন্তরাত্মার সহায় ও শুদ্ধিকারক হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের লক্ষ্য হবে পবিত্রতা, কিন্তু তা শূন্যের নয় বা নিষ্প্রাণ ও কঠোরও নয়। আত্মদান, আত্মদান, সদাই আত্মদান। তবে ভগবান ও মানবতার জন্যে, দানবের জন্য নয়। স্বার্থপরতা আত্মাকে নিধন করে, তাকে বিনাশ কর। কিন্তু দেখো তোমরা পরহিতৈষণা যেন অপরের আত্মাকে নিধন না করে। সচরাচর পরহিতৈষণা স্বার্থপরতাই মহত্তম রূপ। পরহিত, কর্তব্য, সংসার, দেশ, মানবতা আত্মার নিমিত্ত না হলে তাকে বন্দি করে ফেলে।

মানুষের দুঃখের গাছটির শাখাগুলি কেটে ফেলা ভালো কিন্তু তারা আবারও জন্মায়, তার শিকড়গুলিকে উপড়ে ফেলে দিলে দেওয়া হল বৃহত্তর ভাগবত সহায়তা। ব্রত যখন মানুষী দৃষ্টিতে ব্যর্থ ও নিরর্থক, তখন তা চুকে গেল না, আত্মা যখন তার সকল প্রচেষ্টাই ছেড়ে দেয় তখন সব মিটে গেল। স্বার্থপরতা একমাত্র পাপ, সংকীর্ণতা একমাত্র কুপ্রবৃত্তি, ঘৃণা একমাত্র অপরাধ। এগুলি ছাড়া সবকিছুকেই ভালোয় পরিবর্তিত করা যায়, কিন্তু এগুলি হল দেবতার অনমনীয় প্রতিবন্ধক।

–শ্রীঅরবিন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২১৬৭

পাশাপাশি ঃ ১। থাকার বা বসবাসের জায়গা ৩। যে কাজ এখনও শেষ হয়নি ৪। যজ্ঞ বা পুজোর হোম ৫। প্রাণবন্ত বা সতেজ ৭। শ্রমিকের শ্রম ১০। এক ধরনের জিয়ল মাছ ১২। বিখ্যাত মোগল সম্রাট ১৪। বৃত্ত অথবা গোলাকার বস্তু ১৫। সংগৃহীত বা সঞ্চিত ১৬। সুপুষ্ট, সুডৌল বা গোলগাল।

উপর–নীচ ঃ ১। প্রচুর অর্থ বা একসঙ্গে অনেক টাকা পয়সা ২। পাড়া, এলাকা বা অঞ্চল ৩। নুন আনতে পানতা ফুরানোর অবস্থা ৬। উইপোকা ৮। হুক্কা হুয়া বলে ডাকে যে প্রাণী ৯। লেবু ও চিনি দিয়ে তৈরি ঠান্ডা পানীয় ১১। নীল রংয়ের পদ্মফুল ১৩। সূর্যের পরিক্রমার পথ।

সমাধান ■ ২১৬৬

পাশাপাশি ঃ ১। কালিদাস ৫। লেখক ৬। ঢালাইকর ৮। পাক ৯। বক ১১। বাজনদার ১৩। সরস ১৪। অগ্নিশিখা।

উপর–নীচ ঃ ১। পলেস্তারা ২। কাক ৩। দাখিলা ৪। দুয়ার ৬। ঢাক ৭। ইচ্ছুক ৮। পাচন ৯। বর ১০। সারসত্য ১১। বাথান ১২। দাবাগ্নি ১৩। সখা।

সরকার উদাসীন, দাবি আদায়ের পথ খোঁজার দায় কিন্তু কৃষকদেরই

দিল্লিতে সাম্প্রতিক সমাবেশ থেকে এটা স্পষ্ট কৃষকদের মানসিকতায় বদল ঘটেছে। তাঁরা অন্তত রপ্ত করতে পেরেছেন প্রতিবাদের ভাষা, লিখেছেন **যোগেন্দ্র যাদব**।

একবার কৃষক নেতা দীনবন্ধু চৌধুরি বলেছিলেন, কৃষকদের আচরণে দুটি পরিবর্তন জরুরি। এক, নিজেদের সমস্যা নিয়ে সরব হওয়া। দুই, শত্রুকে চিনে নেওয়া। মনে হচ্ছে ভারতের কৃষকরা বোধহয় তাঁর বক্তব্যের মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কয়েকদিন আগে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে ২০০টির বেশি কৃষক সংগঠন যৌথভাবে ‘কিষান মুক্তি মোর্চা’ নিয়ে যেভাবে দিল্লিতে এসেছিল তাতে কৃষকদের মানসিকতা বদলের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকরা অন্তত প্রতিবাদের ভাষাটাকে রপ্ত করতে পেরেছেন।

গত ১০০ বছরে এদেশে যেকয়টি কৃষক আন্দোলন হয়েছে সেগুলির সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হল, আন্দোলনকারীরা কখনই ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি। স্মরণাতীতকালের মধ্যে ভারতের কৃষিজীবীরা এমন কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি যার প্রভাব সারা দেশে অনুভূত হয়েছে। যে কারণে সেগুলি ব্যর্থ হয়। আঞ্চলিকতার গণ্ডি টপকে কৃষক আন্দোলনের ব্যাপ্তি ধীরে ধীরে হলেও যে আসমুদ্র হিমাচলকে স্পর্শ করছে এই প্রথমবার তা ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে। এবার দিল্লিতে অখিল ভারতীয় কিষান সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতির ছাতার তলায় ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সব মত ও পথের কৃষকরা সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের পাশে শহুরে বুদ্ধিজীবী, উকিল, ডাক্তার, ছাত্রছাত্রীদেরও দেখা মিলেছে। এবার কৃষকরা শুধু প্রতিবাদ করেই শান্ত হননি, বিকল্প পথের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সরকারের কাছে তাঁরা কী চান তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন।

দিল্লিতে আসা আন্দোলনকারীরা দাবি করেছিলেন, কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সংসদে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করুক সরকার। সেই অধিবেশনে দুটি আইন পাস করা হোক। প্রথমটি ফসলের সহায়ক মূল্য সংক্রান্ত। এই আইনের মাধ্যমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাওয়ার বিষয়টি আইনি নিশ্চয়তা পাবে। দ্বিতীয়টি কৃষিঋণ মকুবের বিষয়ে। এই দাবিটি অবশ্য বিল হিসেবে ইতিমধ্যেই সংসদে পেশ করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্প্রতি দিল্লিতে যে কৃষক সমাবেশ হয়ে গেল তাতে যোগ দিয়েছেন রাহুল গান্ধি, সীতারাম ইয়েচুরি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, দীনেশ ত্রিবেদী, ফারুখ আবদুল্লা, শরদ যাদবের মতো বিরোধী নেতারা। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁরা কৃষকদের দাবিকে সমর্থন করেছেন। আশা করা যায়, এবার বোধহয় কৃষকদের দাবিগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

দীনবন্ধু চৌধুরি যে শত্রু চেনার কথা বলেছিলেন সেই বিষয়টি আরও জটিল। ‘কৃষকবিরোধী’ শব্দটির তিনটি আলাদা অর্থ হতে পারে। প্রথমত, কৃষক সম্প্রদায়ের বিরোধিতা। এভাবে কৃষক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা করে দেওয়া হয়। কৃষকরা গুরুত্ব পেলে কারও কারও স্বার্থে আঘাত লাগতেই পারে। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই কৃষকদের চাপে রাখতে চাইবেন। কৃষক বিরোধিতার দ্বিতীয় যুক্তিগ্রাহ্য অর্থটি হতে পারে আদর্শগত বিরোধ। যাঁরা কৃষক আন্দোলন ব্যর্থ হলে খুশি হবেন তাঁদের সবাইকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করাটা অতিসরলীকরণ হবে। আদর্শগত বিরোধীদের মধ্যে অনেকেই কৃষকদের প্রতি দয়াপরবশ হতেই পারেন। আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে যে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এটা তাঁরা স্বীকার করেন। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে কৃষকদের ক্ষমতায়নকে কোনো পরিস্থিতিতেই মান্যতা দিতে চান না। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কৃষকদেরও যে একটা ভূমিকা থাকবে এটা প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণিগুলির মেনে নিতে কষ্ট হয়।

আদর্শগত মতভেদ থাকতেই পারে। শ্রেণি স্বার্থ সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব নতুন নয়। সারা বিশ্বেই আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে এই ধরনের টানাপোড়েন চলছে। তবে কৃষকদের সঙ্গে যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাত রয়েছে তাঁরাও কিন্তু কৃষি সংকটের কয়েকটি দিককে উপেক্ষা করতে পারবেন না। কৃষকরা হলেন এমন একটি গোষ্ঠী যাঁরা চিরাচরিতভাবে অবহেলিত ও শোষিত। খাদ্য উৎপাদন করতে গিয়ে অতীতে তাঁরা যেসব সমস্যার জাঁতাকলে পিষ্ট হতেন এখনও তার অনেকগুলি বিদ্যমান। একথা ভুললে চলবে না কৃষকরা চাষ করতে না পারলে সমাজের বাকি অংশকেও তার খেসারত দিতে হবে। আধুনিক দুনিয়ায় শ্রেণি–গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কৃষকদের সমস্যা সমাধানের আশু প্রয়োজন রয়েছে।

কৃষক বিরোধিতার তৃতীয় বিশ্লেষণটি ‘ব্যবস্থাগত বিরোধ’ সংক্রান্ত। ব্যবস্থাগত বিরোধ বলতে এমন সব রাষ্ট্রীয় নীতি ও কিছু সংস্থার কাজকর্মকে বোঝায় যার ফলে পরোক্ষে হলেও কৃষকদের সমস্যায় পড়তে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম তৈরির সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞ, সকলেই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় কৃষকদের বিরোধিতা করছেন। তবে ব্যবস্থাগত বিরোধ সবার অজান্তেও ঘটতে পারে। নিজেদের কৃষকদরদি বলে মনে করা ব্যক্তিদের মাধ্যমেও কৃষকদের ক্ষতি হতে পারে। এই ধরনের বিরোধ অনেক সময় উদাসীনতা থেকেও সৃষ্টি হয়।

দিল্লিতে এখন যে কৃষক সংগঠনগুলি আন্দোলন করেছে তাদের ধারণা, নরেন্দ্র মোদির সরকার হল দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কৃষকবিরোধী সরকার। বর্তমান সরকারের কৃষক বিরোধিতা শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভোটের আগে কৃষকদের প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া আর নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর সেগুলি বেমালুম ভুলে যাওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের এই কৌশল নতুন নয়। পূর্বসূরিদের সঙ্গে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পার্থক্যটা হল মোদিজি শুধু নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করছেন না, উলটে দাপট দেখাচ্ছেন। কৃষকদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া বড়ো কথা নয়, কিন্তু মোদি জমানায় সরকারি দাবি ও বাস্তবের মধ্যে তফাত অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। কৃষক কল্যাণের নামে সরকার আদতে পুঁজিপতিদের মদত দিচ্ছে।

শুধু এই সব কারণের জন্য মোদি সরকারকে সবচেয়ে কৃষকবিরোধী সরকারের তকমা দেওয়া হচ্ছে না। বলা হচ্ছে কারণ, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগতভাবে কৃষকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। সরকার ব্যবহারিক, মানসিক ও ভাবাত্মক তিনটি স্তরে কৃষকদের বিরোধিতা করছে। সরকারের কৃষকবিরোধী অবস্থানকে বুঝতে হলে শুধু এর নীতিগুলি বিশ্লেষণ করলে চলবে না। সরকারের সামগ্রিক অবস্থানকে অনুধাবন করতে হবে। মোদির রাজত্বে এমন সব প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হয়েছে যারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের দুর্বল করার কাজ করছে। তা সে বৈদেশিক বাণিজ্য হোক বা বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত পর্যালোচনা, সবক্ষেত্রেই কৃষকবিরোধী প্রভাবকে সক্রিয় থাকতে দেখা যাচ্ছে। পরিবেশ সংক্রান্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে এই সরকার যে নীতি নিয়ে চলছে তাও মোদিজির কৃষকবিরোধী অবস্থানকে জোরালো করেছে।

মোদিরাজ যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করছে তাতে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়বে আর কৃষকরা বাড়ি–জমি ছেড়ে শহরে চলে যেতে বাধ্য হবেন। তবে কৃষকদের দুরবস্থার সব দায় মোদি সরকারের উপর চাপালে অন্যায় হবে। গত সাত দশকে স্বাধীন ভারতে যতগুলি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে তাদের প্রত্যেকেই কমবেশি কৃষকবিরোধী নীতি নিয়ে চলেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির প্রতি সরকারের উদাসীনতা বেড়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তার পূর্বসূরিদের এটাই একমাত্র তফাত। গবেষণা করলে হয়তো দেখা যাবে মনমোহন সিং–এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার সম্ভবত মোদি সরকারের চেয়েও বেশি কৃষকবিরোধী ছিল। নিজেকে কৃষকদরদি বলে দাবি করতেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া। কিন্তু ব্যবস্থাগত দিক দিয়ে তাঁর সরকারের কৃষক বিরোধিতার মাত্রা এখনকার চেয়ে খুব কম কিছু ছিল না। অতীত ও বর্তমান সরকারগুলির মধ্যে তফাত বলতে শুধু এটুকুই যে, মোদির পূর্বসূরিদের কৃষক বিরোধিতার একটা মাত্রা ছিল। মোদি সরকার সেই গণ্ডিটাও টপকে গিয়েছে। এই সরকারের নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি কৃষক বিরোধিতার ক্ষেত্রে একটা মাত্রা টানতে পারেন।

মোদি সরকারের বিশেষত্ব হল এরা ব্যবস্থাগত বা আদর্শগতভাবেই কৃষকদের বিরোধিতা করছেন না, সম্প্রদায়গতভাবেও কৃষিজীবীদের বিরোধিতা করছে। কেন্দ্র একদিকে যেমন জমি অধিগ্রহণ আইনে সংস্কারের নামে জমির উপর কৃষকদের অধিকারকে দুর্বল করেছে তেমনই জঙ্গলের উপর তাদের অধিকারকে খর্ব করার চেষ্টা করছে। খরার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সরকারকে চোখ বন্ধ করে থাকতে দেখা গিয়েছে। ফসলের দামের পতন রুখতে তাদের উদ্যোগ নজরে আসেনি। কৃষিকাজের খরচে লাগাম পরানো নিয়েও সরকার নীরব। নোটবন্দির ফলে কৃষকদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কান্ডারিরা একটি কথাও বলছেন না। ইতিহাস ঘাঁটলে এমন একটি সরকারের হদিস মিলবে না যাদের মধ্যে কৃষকদের প্রতি এতটা পরিমাণে সংবেদনশীলতার অভাব রয়েছে।

দিল্লিতে কৃষকদের সাম্প্রতিক জমায়েত থেকে ওঠা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মোদি সরকার যদি সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকে দুটি আইন পাস করার উদ্যোগ নেয় (যে আইনগুলি সম্পর্কে এই লেখার প্রথম ভাগে আলোচনা করা হয়েছে) তাহলে সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়গা থাকবে না। কিন্তু যদি তা না ঘটে, সেক্ষেত্রে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কৃষকদেরই ঠিক করতে হবে কীভাবে তাঁরা নিজেদের দাবি আদায় করবেন।

(লেখক স্বরাজ ইন্ডিয়ার সভাপতি)

> মোদিরাজ যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করছে তাতে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়বে, কৃষকরা বাড়ি–জমি ছেড়ে শহরে চলে যেতে বাধ্য হবেন। স্বাধীন ভারতে যতগুলি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে তাদের প্রত্যেকেই কমবেশি কৃষকবিরোধী নীতি নিয়ে চলেছে। তবে মোদির পূর্বসূরিদের কৃষক বিরোধিতার একটা মাত্রা ছিল। মোদি সরকার সেই গণ্ডিটা টপকে গিয়েছে।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

নোংরা করার অভ্যাস বন্ধে পদক্ষেপ স্বাগত

সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যত্রতত্র পিক, থুতু ফেলে নোংরা করার কুঅভ্যাসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। রেলওয়ে এলাকায় রেল কর্তৃপক্ষ, সরকারি এলাকায় পুলিশ নোংরা বিস্তারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ করছে। পিক ও থুতু যত্রতত্র ফেলতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে কোথাও বা আর্থিক জরিমানা করা হচ্ছে, কোথাও বা নোংরাকারীকে দিয়েই নোংরা পরিষ্কার করানো হচ্ছে। অপকর্মটি করতে গিয়ে ধরা পড়ে অনেকই ভালোমানুষের মতো দোষ স্বীকার করে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ না করার অঙ্গীকার পর্যন্ত করে ফেলছে। কেউ কেউ অবশ্য বলেছে, কফ, থুতু তো মানুষকে ফেলতেই হয়। তা ফেলার মতো জায়গার ব্যবস্থাও তো থাকা দরকার। কথাটির কিন্তু গুরুত্ব রয়েছে। তবে একথাও ঠিক যে ব্যবস্থা যেমন থাকা প্রয়োজন, তেমনি কোনো এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে মানুষের সক্রিয় সহযোগিতাও ততটাই প্রয়োজন।

সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের দেশের লোকেদের পরিচ্ছন্নতার ধারণাটা একটু গোলমেলে। নিজের ঘরের চৌহদ্দি ছাড়া যেকোনো জায়গাকে অপরিচ্ছন্ন করতে তাদের একটুও বাধে না, সে রেলস্টেশন, হাসপাতাল, অফিস আদালত, ব্যাংক, রাস্তাঘাট যাই হোক না কেন। হাটবাজারের কথা তো না বলাই ভালো। তাই নিজে থেকে যখন মানুষ সচেতন হচ্ছে না তখন কড়া দাওয়াই প্রয়োজন বইকি। শুধুমাত্র ঝাঁটা বুলিয়েই তো সর্বাঙ্গীণ স্বচ্ছতা আনা সম্ভব নয়।

আর এই বদভ্যাসের ক্ষেত্রে শহর, গ্রাম সব জায়গার মানুষই সমান।

এই আলিপুরদুয়ার শহরের কথাই ধরা যাক। অল্প কিছুদিন আগে তৈরি শহরের একমাত্র ফ্লাইওভারটি (সুন্দর রং করা) পিক ফেলে কলঙ্কিত করতে শহরের মানুষের একটুও বাধেনি। শহরের সুপার মার্কেটের ভেতর, যেখানে সেন্ট্রাল ব্যাংক, ইউনাইটেড ব্যাংক ইত্যাদি রয়েছে, যেখানে প্রতিদিনই বহু মানুষকে নানান কাজে যেতে হয়, সেখানে পৌঁছোনোর যে সিঁড়ি রয়েছে তা বোধহয় তৈরি হওয়ার পর কোনোদিনও সাফসুতরো করা হয়নি। আর কোনো কোনো ধাপ তো পিকে এমন রক্তারক্তি যে দেখলে বমি আসে। দেশজুড়ে যে স্বচ্ছতা অভিযান তার আওতায় কি আলিপুরদুয়ার শহর পড়ে না ? শহরে এই অপরিচ্ছন্নতা রোধ করার জন্যে তো নজরদারি আবশ্যক। শহর যত ছোটোই হোক, তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলতে তো কোনো বাধা নেই। আলিপুরদুয়ার শহর নাকি ‘ডুয়ার্সের রানি’। তা সেই রানির নিয়মিত ‘ফেসিয়াল’–এর উদ্যোগ নিলে শহরের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ দুই–ই বাড়বে সন্দেহ নেই।

রমা কর্মকার
আলিপুরদুয়ার জংশন।

অটোয় এক আসনে কয়জন বসবেন ?

একটি অটোতে দুদিকের আসনে মোট কয়জন বসবেন সেটি স্থির করার দায়িত্ব কার ? যাঁরই হোক না কেন, তিনি বা তাঁরা কেউই সাধারণ লোক নন। তাঁরা দুদিকের আসনে চারজন করে বসে যাত্রীসাধারণের সুবিধা–অসুবিধা দেখবেন এমনটা আশা করা যায় না। এনজেপি থেকে বা মেডিকেল থেকে এক একটি অটোতে ১২–১৩ জন করে যাত্রী সওয়ার হচ্ছেন প্রশাসনের নাকের ডগায়। এভাবেই চলছে। শিলিগুড়িতে যেন এটাই নিয়ম।

কিন্তু কিছুদিন আগে একটি ঘটনায় মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে দু–একটি প্রশ্ন না করে থাকতে পারলাম না। একদিকের আসনে চারজন বসার অর্থ একজনকে প্রায় কোলেই বসে যেতে হয়। একদিনের আসনে তিনজনই স্বচ্ছন্দে বসতে পারেন, সে ব্যবস্থাই থাকা উচিত। সেদিন এক মহিলাকে অটোর চালক বললেন, চেপে বসুন। মহিলা বললেন, কোথায় বসব? চালক বললেন, না পোষালে নেমে যান। এখানে এভাবেই যেতে হবে।

হ্যাঁ, শিলিগুড়ি শহরে শালীনতা, শোভনতা বলে কিছু নেই। তিনজন মহিলার মাঝখানে একজন পুরুষ বা তিনজন পুরুষের প্রায় কোলে বসেন একটি মেয়ে। এখানে এমন দৃশ্য খুবই স্বাভাবিক। কোনো প্রতিবাদ নেই।

যাই হোক, ওই মহিলা নেমে গেলেন। সেই সঙ্গে অটোচালকের আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা কয়েকজনও নেমে গেলাম। কিন্তু এটুকু প্রতিবাদেই সমস্যাটা কি মিটবে? এই অব্যবস্থার সুরাহা হবে কীভাবে ? করবেন কে? আমাদের প্রতিদিনই ইউনিভার্সিটি যেতে হয়। মাঝেমধ্যে যেতে হয় এনজেপি, এভাবেই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখুন এবং সমস্যাটার সমাধান করুন।

অনন্যা সরকার, বাঘাযতীন পার্ক, শিলিগুড়ি।

ইলিশের বিক্রি তলানিতে

এবছর ইলিশের মরশুম শেষ হয়ে গেলেও এখনও বাজারে প্রায় সব মাছের দোকানে ভালো পরিমাণে ইলিশ আসছে। এই ইলিশ স্বাদেগন্ধে গঙ্গা, রূপনারায়ণের সমতুল্য নয়। তাই বিক্রিও তলানিতে। অনেকেই অসময়ের ইলিশ খেতে ভয় পান। শুনছি এই ইলিশ নাকি বহির্বঙ্গের থেকে আসছে। মায়ানমার, মুম্বই ইত্যাদি জায়গা থেকেও ইলিশ আসছে। প্রায় খোকা বা মাবনারি সাইজের ইলিশ দিয়ে উদরপূর্তি হলেও রসনার তৃপ্তি হচ্ছে না। তাই বিক্রিও তলানিতে।

গৌতম দত্ত, অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

টোটোর দৌরাত্ম্য

সিটি অটোর দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে চালু করা হয়েছিল টোটো। ধোঁয়া, গন্ধহীন টোটোর যাত্রী পরিবহণ ক্ষমতা চারজন হলেও মাত্র দুজন বা কখনও কখনও একজন হলেই টোটো যাত্রা শুরু করে দিত এবং যাত্রাপথে দু–একজন যাত্রী পেলে তাদের তুলে নিয়েই দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিত। এখন সেই গুণ আস্তে আস্তে উবে যাচ্ছে। চারজন যাত্রী না হলে কিছু টোটো স্টার্টই করতে চায় না, যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিছু টোটোকে সন্ধের দিকে পিছনে ছয়জন, ড্রাইভারের দু–পাশে দুজনকে বসিয়ে যেতে দেখি। অটোর বদগুণগুলো টোটোতে ফিরে আসছে।

জয়ন্ত দাস, ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

এ বিভাগে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে পত্রলেখকরা চিঠি পাঠান। পাঠাতে হবে জনমত বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি– এই ঠিকানায়।

বইপাড়া

রসিকবিল

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের আমবাড়ি এলাকার চাকিয়াভিটা গ্রামের লোকদেবতা ফালাকাটা ঠাকুর। আমগুড়ি–ফালাকাটা রেলস্টেশন থেকে চেউলগুড়ি যাওয়ার পথে তাঁর থান। তাতে তিন পুরুষদেবতা– ফালাকাটা, তুলাকাটা, ধুনাকাটা। তিন ভাই। তাঁদের বাহন বাঘ। এঁদের নিয়ে রসিকবিল–এ দীপককুমার রায়ের প্রবন্ধ পাঠককে আকর্ষণ করবে। এ পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে একটি আলোচনা। বিষয়– দার্জিলিংয়ে নেপালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ। লেখক আনন্দগোপাল ঘোষ। তথ্যসমৃদ্ধ এই আলোচনা পাঠককে সমৃদ্ধ করবে। আমিনুল আহসান লিখেছেন, শিক্ষকদের নিয়ে এক অসাধারণ প্রবন্ধ ‘জীবনের ধ্রুবতারা’। তা পাঠে মুগ্ধ হতে হয়। সুশীলকুমার রাভার ‘প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতি’ ভালো লেগেছে। পত্রিকায় আরও কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রয়েছে। আর রয়েছে অসংখ্য কবিতা, কিছু গল্প। সবার নাম উল্লেখ সম্ভব নয়। কবিতা ও গল্প নির্বাচন প্রশংসনীয়। এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন হরিদাস পাল। পত্রিকা প্রকাশিত হয় তুফানগঞ্জ থেকে।

চলো কিছু লিখি

দিনহাটা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা ‘চলো কিছু লিখি’। সম্পাদক অমিত রায়। এ পত্রিকা মানবিকতার পক্ষে। অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং ভ্রাতৃত্ববোধের পক্ষে। পত্রিকায় প্রাধান্য পেয়েছে কবিতা ও ছড়া। অণুগল্প রয়েছে, রয়েছে ছোটোগল্পও। লেখকসূচিতে রয়েছেন অমর চক্রবর্তী, শৈবাল মজুমদার, মানিক সাহা, মৃগাঙ্ক সরকার, শুভাশিস দাশ, শিবপ্রসাদ রায়, জয়ন্ত চক্রবর্তী, ডালিয়া চক্রবর্তী, দুলাল রবিদাস, পাপড়ি গুহনিয়োগী, উজ্জ্বল আচার্য, রম্যানী চৌধুরি প্রমুখ।

জলপিপি

বিবেক কবিরাজ সম্পাদিত ‘জলপিপি’ প্রকাশিত হয় শিলিগুড়ি থেকে। কবিতার কাগজ। উৎসব সংখ্যায় রয়েছে বেশকিছু সুনির্বাচিত কবিতা। মহুয়া লিখেছেন, ‘একটা ভেতরের ইচ্ছে আগুন হয়ে জ্বলে/তার কিছু একটা চাই’। পায়েলী ধর ‘জন্মদিন’–এ লিখেছেন ‘অতলান্ত স্নান সারি/ কিছুটা প্লাবন মুখরতায়/স্রোত বলতে যা কিছু জানি/তারই প্রতিরোধে খুলেছি ডানা’। সন্তোষ সিংহের কবিতা – ‘আমরা চোখ বুজে নিয়েছি পথ খুঁজে/ বুঝিনি কোনোদিন যাপিত ভুল।/ বিষাদ ছুড়ে দিয়ে ক্রমশ আমাদের/এতটা করে যাবে ছিন্নমূল।’ মৌসুমী চৌধুরির কবিতা –‘বুকের পরতে পরতে মিশে ছিল আঁচলটা/মিশে ছিল রক্তে–মজ্জায়, শিরা উপশিরায়/ সে আঁচলের প্রতিটি টানাবানায় বোনা ছিল প্রেম/প্রতি রংয়ে মিশে ছিল অথৈ আবেগ ... ।’ এমনই সব কবিতা রয়েছে পত্রিকায়। অন্য যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন পারুল কর্মকার, মলয় দত্তা, ঈঙ্গিতা চক্রবর্তী, হরে বর্মন, বিপ্লব সরকার, কিশলয় গুপ্ত, নীলাদ্রি দেব, শুভদীপ ঘোষ, মৃণালিনী, সুবীর সরকার, আফজাল মালি, স্মৃতিজিৎ, দীপশিখা চক্রবর্তী, কাজল দাস, মনোনীতা চক্রবর্তী, লাবণি বর্মন, রিয়া বাড়ই দাস প্রমুখ।